দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12-OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৭

ড. ম ম তা জ উ দ্দী ন পা টো য়া রী

ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসঙ্গে

কিছুদিন হলো পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নামক পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ছাত্রদের একটি ছাত্র সংগঠন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করাসহ ৫ দফার একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। ঐদিনই তারা উক্ত ৫ দফার সমর্থনে মুক্তাঙ্গনে একটি সমাবেশও করেছে। তাদের ৫ দফার মধ্যে রয়েছে– পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা, জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর যে কোন বক্তব্য পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া, পাহাড়ী জাতিসত্তার সঠিক ও সংগ্রামী রাজনৈতিক ইতিহাস সংবলিত পাঠ্যপুস্তক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল ও কলেজে অন্তর্ভুক্ত করা, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সার্বিক তথ্য সংবলিত পরিচিতিমূলক পুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার প্রধান দেশ বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দাবিসমূহকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের বোধ ও উপলব্ধির বিষয়টিকে অত্যন্ত ইতিবাচক চিন্তা বলেও মনে করছি। কেন তা মনে করছি সে প্রসঙ্গই এই নিবন্ধে তুলে ধরছি। বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতল ভূমিতে ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে এদের সংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ জন দেখানো হয়েছে। ঐ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.১৩% তারা। তবে সকলেই মনে করছেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রকৃত জনসংখ্যা তখন আরো বেশী ছিল। সে সময়ে অনেকেই মনে করতেন যে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ২০ লাখের অধিক হবে। গত ১১ বছরে এই সংখ্যাটি বেড়ে ২৫ থেকে ৩০ লাখে উন্নীত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও সাঁওতাল জনসংখ্যা সর্বাধিক (যথাক্রমে ২,২৫,৮৫৮ এবং ২,০২,১৬২ জন) দেখানো হয়েছে। সবচাইতে ছোট ম্রো জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১২৬ জন বলে জানা গেছে। ঐ পরিসংখ্যানে সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী পাত্র জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ নেই, এদের সংখ্যাও ম্রো জাতিগোষ্ঠীর মতোই একশ'র খুব বেশী নয়। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী আবার এতই ছোট যে যাদের মোট জনসংখ্যা ২০০ জন অতিক্রম করছে না, এরা বিলুপ্তির প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। এসব অতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের বিশেষ আনুকূল্য, যত্ন ও সমর্থন না পেলে অদূর ভবিষ্যতে একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সামগ্রিক অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে ৯৮ শতাংশ [illegible] তেমন স্বচ্ছ নয়। আমাদের অধিকাংশ মানুষই মনে করে থাকেন যে, বাংলাদেশ হচ্ছে One Nation state অর্থাৎ বাঙালী জাতিসত্তার একক রাষ্ট্র। ষাট এবং সত্তরের দশকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের তুমুল উত্থানের যুগে আশপাশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখা হয়নি; তখন প্রথমত ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম। উক্ত সংগ্রামে জয়লাভের ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে এককভাবে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীর করে দেখা হয়েছে, ভাবা হয়েছে। আসলে সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল বলতে গেলে এককভাবে বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে। তাছাড়া পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা– যা ব্যাপক বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে পড়তে পারে– এমন আশা করা ছিল বেশ কঠিন। তারপরও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৃহত্তর অংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদিও সংগত কারণেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তাদের ভবিষ্যৎ মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তারা যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘোষিত চার জাতীয় নীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট অবস্থান থাকলেও এ সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়সমূহ স্পষ্ট করে বেলা হয়নি, বিবেচনায়ও আসেনি। আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও জাতিগত বিশেষ বৈচিত্র্যের এই বাংলাদেশের ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এটি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে তেমনটি মনে হয় না। আসলে ছোট-বড় বহুজাতিসত্তার সঙ্গে আমাদের মেলামেশা, বসবাস, দেখা-সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা কোনকালেই তেমন একটি ছিল না। আধুনিক যুগে এ বিষয়গুলো প্রায়ই বেশ জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে তেমন ধারনাও আমাদের ছিল না। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বাঙালী জাতিসত্তার একচ্ছত্র প্রভাবের ধারণা ও আবেগ থেকে আমাদের নেতৃত্ব তখন বের হতে পারেননি, স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সমস্যাটিকে ভবিষ্যতের দিকে দেখা ও বোঝা তাদের পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। ফলে সংবিধান প্রণয়নকালে সমস্যাটির গুরুত্ব ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। অথচ ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে আমরাই মাতৃভাষা এবং জাতিসত্তার অধিকারের কথা বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিষয়টিকে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে দেখলেও ছোট ছোট জাতিসত্তার অবস্থান থেকেও দেখার রয়েছে যে, তা উপলব্ধি করতে পারিনি। ফলে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমাদের বাঙালী নেতৃত্বের যে দূরত্ব তৈরী হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই কোন না কোন ভাষার উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এটি ঐ জাতির গৌরবময় অর্জন ও সম্পদও বটে। তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে, কোন ভাষা কোন একটি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হলেও এটি বিশ্ব পরিসরে সকল মানবজাতিরই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এটিকে অবহেলা করার কোন কারণ নেই। এক সময় নানা কারণে অসংখ্য ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে– যা মানবসভ্যতার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এখন চেষ্টা চলছে ছোট ছোট জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষা সংরক্ষণ করার। আমাদের দেশেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষার বিকাশ সাধনের বিষয়গুলো ইদানীং গুরুত্বসহকারে আলোচিত হচ্ছে। আমাদের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব মৌখিক ভাষা রয়েছে, যদিও অধিকাংশেরই লেখ্য ভাষা বা বর্ণমালা নেই। তবে প্রধান চারটি ভাষা পরিবারের সঙ্গে এগুলো জড়িত। ভাষা পরিবার চারটি হচ্ছে আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতী-বর্মী।।

প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই কোন না কোন ভাষার উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এটি ঐ জাতির গৌরবময় অর্জন ও সম্পদও বটে। তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে, কোন ভাষা কোন একটি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হলেও এটি বিশ্ব পরিসরে সকল মানবজাতিরই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এটিকে অবহেলা করার কোন কারণ নেই। এক সময় নানা কারণে অসংখ্য ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে– যা মানবসভ্যতার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এখন চেষ্টা চলছে ছোট ছোট জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষা সংরক্ষণ করার। আমাদের দেশেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষার বিকাশ সাধনের বিষয়গুলো ইদানীং গুরুত্বসহকারে আলোচিত হচ্ছে।

যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রতিটি জাতিসত্তাই তাদের বর্ণমালার প্রচলনসহ মাতৃভাষার একটি আধুনিক রূপ উপস্থাপন করতে পারবে– এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, অসংখ্য ভাঙ্গাগড়ার চড়াই-উৎরাই পার হয়েই ভাষা এগিয়ে চলে নিরন্তর গতিতে। সুতরাং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোন কারণ নেই। কোন জাতিসত্তাই তাদের মাতৃভাষাকে ত্যাগ করতে আগ্রহী নয়। চর্চার সুযোগ থাকলে যে কোন শিশুই মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করতে আগ্রহী হবে– এটিই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা ব্যতীত শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ হয় না। সুতরাং খুব ছোট হলেও বাংলাদেশের ৩০টির অধিক জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির দাবিটি কোনভাবেই অন্যায্য হতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যেসব ভাষার বর্ণমালা নেই, ব্যাকরণ, সাহিত্যসহ অনেক কিছুই নেই তা উদ্ভাবন করা সম্ভব কিনা। এটি অসম্ভব কিছুও নয়। হয়তো সময় সাপেক্ষের ব্যাপার। ঐ জনগোষ্ঠীর মেধা ও মননকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে, লাগাতে সুযোগ দেয়া হলে তা নিজস্ব নিয়মে একটি রূপ পরিগ্রহ করবেই। অন্য কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী এ কাজটি কোনভাবেই করতে পারবে না, করা উচিতও নয়। বাংলাদেশের যেসব জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার লিখিত বর্ণমালা রয়েছে তাদের বিষয়টি অনেকটা এগিয়ে আছে। কিন্তু নানা কারণেই এসব ভাষায় দেশের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচিত না হওয়ায় ঐসব জাতিগোষ্ঠীর শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করতে পারে না; শিশুদের জন্য এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বটে। এরা ঘরে-বাইরে চাকমা, মনিপুরী, সাঁওতাল ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে, অথচ লেখাপড়া করতে চাইলেই তাদেরকে বাংলা ভাষার স্কুলে ভর্তি হতে হয়, বাংলা ভাষাতেই সবকিছু পড়তে হয়। অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জন্য এটি একটি মস্ত বড় বাধা এবং সঙ্কটও বটে। বাংলাদেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তকের মূল ধ্যান-ধারণাতেই রয়েছে ধর্মীয় এবং জাতিগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একচ্ছত্র প্রভাব এবং আধিপত্য। এটি এসব অনগ্রসের জাতিগোষ্ঠীকে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে থাকে। আমাদের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জীবন-জীবিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন বাস্তবভিত্তিক রচনা সন্নিবেশিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত পরিচ্ছেদ পাঠ করে বাঙালী শিশুরা উপজাতীয়দের সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করছে তা কোনভাবে শিশুদের মনে সম্প্রীতির ভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। অপরদিকে ঐসব জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা তৈরীতে সাহায্য করছে না। বাঙালীদের ব্যতীত অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্য, ইতিহাস, শৌর্য-বীর্য নিয়ে রচিত কোন কবিতা, গল্প, ইতিহাস এসব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জানি বিষয়টি বেশ জটিল এবং স্পর্শকাতর। কিন্তু ৩০টির বেশী জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা স্কুলে পড়বে, তরুণরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, নিজেদের আত্মপরিচয়ে একটি শব্দও পাঠ্যপুস্তকের কোথাও খুঁজে পাবে না– তা কি খুব সহজে মেনে নেয়া যায়? আমাদের জানা মতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরী, সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপক সংখ্যক ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা হোঁচট খেয়েই যাচ্ছে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র প্রভাব ও চাপে পড়ে তাদের চিন্তাশক্তি, মেধা ও মনন যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে না, পারার কথাও নয়। আমার মনে হচ্ছে এ ধরনের একচ্ছত্র অবস্থাতে শিশু ও শিক্ষার্থীদের মনে বৈরী ও বিরূপ ভাবধারাই তৈরী হতে পারে। হ্যাঁ, যদি স্বেচ্ছায় কেউ বাংলা ভাষায় পড়তে আসে তাতে সমস্যা অনেক কম সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাধ্য হয়ে পড়তে আসলে বাঙালীদের প্রতি অশ্রদ্ধার অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ই শিশু-কিশোরদের মনে জন্ম নিতে পারে। আমার ধারণা সেটিই অবচেতনে তৈরী হচ্ছে। আমরা কেন এ ধরনের বিরূপ ধারণা তৈরী হতে সুযোগ দেবো? আসলে প্রতিটি শিশুরই মাতৃভাষা শেখা, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা এবং নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে জানা, জ্ঞান লাভ করা আজকের দুনিয়ায় একটি স্বীকৃত বিষয়। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে মাত্র। প্রতিটি মানুষ যেন আত্মপরিচয়ের কোন দ্বন্দ্ব বা সঙ্কটে জীবন-যাপন না করে সেদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হবে। তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশ্বাস ও আস্থার সৃষ্টি হবে, প্রতিটি মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই শেষ বিচারে লাভবান হতে পারে। এ ধরনের প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশের অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও শিক্ষার সমস্যাকে বিবেচনা করলে, সমাধানের পথে অগ্রসর হলে আমার ধারণা বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবেই লাভবান হবে। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষেই অর্থবহ হয়ে উঠবে।

/লেখক : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্[illegible]/